গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা | ২৮ অক্টোবর - ৩ নভেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

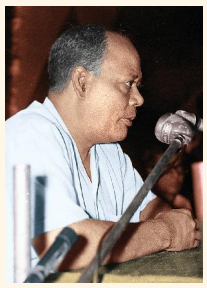

‘‘ভোটের মারফত হাজার বার গভর্নমেন্ট পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইনকানুন সংশোধন করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা থেকে মুক্তি অর্জন অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ বিপ্লবী সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। এ ছাড়া জনসাধারণের মুক্তির আর কোনও দ্বিতীয় রাস্তা নেই।’’

(১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা)

সিঙ্গুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য কর্পোরেট পুঁজিপতিদের তোয়াজ করার উদ্দেশ্যে

সিঙ্গুর আন্দোলন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, ‘‘টাটাকে আমি তাড়াইনি, সিপি(এম)-ই তাড়িয়েছে...’’। এই পরিপ্রেক্ষিতে এস ইউ সি আই (সি) -র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

ইতিহাসের পরিহাস হল, বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের জয় অর্জিত হলেও তাকে ভুলিয়ে দিতে ইতিহাসের সিলেবাসে স্থান না দিয়ে কোর্টের রায়ে সিঙ্গুরে চাষিদের জমি ফিরে পাওয়াকে নিজের কৃতিত্ব বলে জাহির করতে অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস সিলেবাসে তা অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের যা শেখাতে চেয়েছেন, তা আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজেকেই অস্বীকার করতে হচ্ছে। এই সুযোগে সিপিএম তাদের অতীতের টাটা সহ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জনবিরোধী পদক্ষেপ— যার বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে তীব্র গণবিক্ষোভ গড়ে উঠেছিল, তাকে আড়াল করতে চাইছে এবং তাদের অত্যাচারী ভূমিকা যেন সঠিকই ছিল, তা বোঝাতে চাইছে।

এ রাজ্যের সচেতন মানুষ জানেন যে, সিঙ্গুরের আন্দোলন কখনওই শিল্পবিরোধী ছিল না। তিন থেকে পাঁচফসলি জমির অধিকারী ১৫ হাজার চাষির সর্বনাশ করে মাত্র এক হাজার মানুষের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাস্তবে ২০০৬ সালে সিপিএম সরকার সিঙ্গুরের অত্যন্ত উর্বর এক হাজার একর কৃষিজমি টাটাদের উপঢৌকন দিতে চেয়েছিল। তার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের কৃষকরা ‘সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি’ গঠন করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই কমিটি কোনও দলীয় কমিটি ছিল না। সেদিন সিপিএম সরকার রাজকুমার ভুলকে হত্যা করা, তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা সহ পুলিশ এবং গুন্ডাবাহিনী দিয়ে অত্যাচার চালিয়ে সিঙ্গুরের জমির দখল নেয়।

একই প্রক্রিয়ায় সিপিএম নন্দীগ্রামের জমিও দখল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেখানে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি মাটি কামড়ে পড়ে থেকে বীরত্বপূর্ণপ্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলে, বহু রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে আন্দোলনকে সফল করেছিল। ইতিমধ্যে টাটা কোম্পানি এই রাজ্যের সিপিএম সরকারের কাছ থেকে যা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল, গুজরাটের

চারের পাতায় দেখুন

টেট আন্দোলন ঃ পুলিশ দিয়ে দমন করলেও এ লড়াই ব্যর্থ হবে না

তখন প্রায় মধ্যরাত, অনশনের ৮৩ ঘণ্টা অতিক্রান্ত। টানা আন্দোলনের ধকলে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটাকে তারা আস্তে আস্তে ফেলে দিতে থাকলো করুণাময়ীর রাস্তার পিচের ওপর। রেলিংয়ের কাছে রাস্তায় বসে কার্তিকের খোলা আকাশের নিচে সন্তানকে কোলে নিয়ে পিঠ চাপড়িয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে আন্দোলনকারী মা। হঠাৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুলিশকর্মীরা কর্তাদের নির্দেশে জড়ো হতে লাগলো অনশন স্থানের অদূরে। মুহূর্তের মধ্যে সাইরেন বাজিয়ে হাজির উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তারা। গার্ড, মাথায় হেলমেট পরে প্রস্তুত বাহিনী, শেষ মুহূর্তের নির্দেশ দেওয়া চলছে। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রস্তুতি। শত্রু কারা? শত্রু আমার আপনার ঘরের শিক্ষিত ভদ্র সভ্য টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা।

১৯ অক্টোবর কলকাতায় এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে ছাত্র-যুব মিছিল

আন্দোলনের শুরু থেকেই উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইও নেতা-কর্মীরা। তাঁরা ফোনে জানালেন, পুলিশ অ্যাকশন শুরু হবে বোধহয়। কিছু কর্মীকে নিয়ে ছুটে গেলেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মৃদুল

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজিপতি শ্রেণিই তাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলির ভোটের খরচ জোগায়

চলতি বছরে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর, গোয়া এবং পাঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ২২৩.১৪ কোটি টাকা খরচ করেছে বিজেপি। অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর (এডিআর) একটি রিপোর্টে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিজেপি সবচেয়ে বেশি ব্যয় করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। ১০২.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে তারা।

ভোটের সময় বিজেপি-কংগ্রেসের মতো দলগুলি এই যে দেদার টাকা খরচ করে, বিজ্ঞাপনে আকাশ অন্ধকার করে দেয়, প্রচারে কান ঝালাপালা করে দেয়, মোবাইল খুললে হোয়াটসঅ্যাপে স্রোতের মতো মেসেজ ঢুকতে থাকে, তার একটা ভগ্নাংশ মাত্রই খরচের এই ঘোষিত অঙ্ক। এই দলগুলি ভোটে যে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে তার বিরাট একটা অংশ কালো টাকা, যার হিসাব দলগুলি নির্বাচন কমিশনকে দেয় না।

এই টাকাতেই তারা খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইলে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে মানুষের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে ভার্চুয়াল সত্যে পরিণত করে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি অবিরাম এমন করে প্রচার করতে থাকে যাতে মানুষও বার বার দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে এক সময় ভেবে বসে, এ বোধ হয় সত্যি।

এই বিপুল পরিমাণ টাকা, যা এই দলগুলি ভোটে খরচ করে, তা আসে কোথা থেকে? ভোটের প্রচারের জন্য তারা কি জনগণের থেকে চাঁদা নেয়? বড় বড় দলগুলি কেউই জনগণকে টাকা চেয়ে ‘বিরক্ত’ করে না। উপরন্তু তাদের ভোট দিলে দল কী

ছয়ের পাতায় দেখুন

টেট ঃ এ লড়াই ব্যর্থ হবে না

একের পাতার পর

সরকার। বৃহস্পতিবার বিকাল গড়াতেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল। ক্লান্তি ঝেড়ে উঠে বসে চার-পাঁচ-ছয় জনের দলে ভাগ হয়ে আন্দোলনকারীরা শক্ত করে হাতে হাত ধরে গড়ে তুললেন মানবশৃঙ্খল। রাতের প্রায়ান্ধকার আলোয়, নির্জন রাস্তায়, নিরস্ত্র, অনশনে দুর্বল সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ্য সরকারের পুলিশ। পনেরো মিনিটেই অভিযান শেষ। টেনে হিঁচড়ে চ্যাংদোলা করে, মেরে ধরে একের পর এক প্রতিবাদীকে বাসে, প্রিজন ভ্যানে তুলে নেওয়া হল। তখন কারও নাক ফেটে, কারও পা কেটে রক্ত ঝরছে।

'ফুটপাত দখল বেআইনি' বলে সিপিএম সরকারের আমলে প্রকাশ্য দিবালোকে 'অপারেশন সানসাইন' দেখেছেন রাজ্যের মানুষ। আবার রাতের অন্ধকারে আন্দোলন ভাঙতে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার দৃশ্যও বাংলার মানুষের কাছে এই প্রথম নয়। ২০০৬-এর ২৫ সেপ্টেম্বর আন্দোলন ভাঙতে রাতে আলো নিভিয়ে দিয়ে সিঙ্গুর বিডিও অফিসে 'উন্নততর বামফ্রন্ট' সরকারের পুলিশের তাণ্ডব আজও ভোলেনি মানুষ। যে দল গদিতে থাকে তার কাছে জনগণের যে কোনও আন্দোলনই অনায্য, তা সে সিঙ্গুর জাতীয় সড়ক অবরোধ হোক বা কৃষি নীতি বাতিলের দাবিতে সংযুক্ত কিসান মোর্চার দিল্লির রাস্তা অবরোধ। তখন সিপিএম ও বিজেপির সুর রাজ্যের তৃণমূল সরকারের মতোই। শাসকের রং বদলায় চরিত্র বদলায় না, এক শাসকের ভাষা অন্যের মুখে উঠে আসে।

কিন্তু এই প্রতিবাদীরা কারা? কেন এই প্রতিবাদ? এঁরা ২০১৪ টেট-উত্তীর্ণ প্রশিক্ষিত চাকরিপ্রার্থী। গড়ে তুলেছেন আন্দোলনের হাতিয়ার 'একতা মঞ্চ'। কী অদ্ভুত বিষয়! রোজ যাদের দেখে মনে হয় ন্যুব্জ, কুব্জ প্রতিবাদও করতে জানে না, সেই তারাই যখন আক্রান্ত হয়, কোথা থেকে যেন বুঝেযায়—বাঁচতে গেলে, দাবি আদায় করতে গেলে লড়তে হবে, জোট বাঁধতে হবে, গড়ে তুলতে হবে লড়াইয়ের মঞ্চ।

এঁদের দাবি এঁরা আর কোনও ইন্টারভিউতে যাবেন না। ২০২০ সালে ১১ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নবান্নে প্রেস কনফারেন্স করে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছিলেন, তা রূপায়ণ করতে হবে। ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষা উত্তীর্ণদের একসঙ্গে ইন্টারভিউ করা যাবে না। ২০১৪-র নিয়োগ আগে সম্পূর্ণ করতে হবে। কী বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী? বলেছিলেন, '২০ হাজার ছাত্রছাত্রী টেট পরীক্ষায় পাশ করেছে। টেট পরীক্ষায় পাশ করার পর ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করে শূন্যপদ পূরণ করা হবে। এখন শূন্যপদ আছে ১৬৫০০ কিন্তু পাশ করেছে ২০ হাজার। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডিসেম্বর, জানুয়ারির মধ্যে এই ১৬৫০০ পোস্টে অবিলম্বে নিয়োগ হবে আর বাকিদের ধাপে ধাপে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগ করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘোষণা করছেন তখন তৃতীয় টেট অর্থাৎ ২০১৭ টেট হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে তিনটে টেট পরীক্ষা হয়েছে— ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৭ সালে। ২০১২ সালের পরীক্ষা ওই বছর হলেও পরের দুটি নির্দিষ্ট বছরে না হয়ে যথাক্রমে ২০১৫ ও ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে হয় অথচ নিয়ম হচ্ছে, যে বছরে টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা সেই বছরই নিতে হবে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। এখন ২০১৪ সালের টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আট বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও শেষ হল না। এর জন্য কে দায়ী? এই আটটা বছর নষ্ট হওয়ায় যাদের বয়স ৪০ বছর পেরিয়ে গেল, যার জন্য তারা আইন অনুযায়ী আর ইন্টারভিউ দিতে পারবে না তার জন্য কে দায়ী? এই টেট পাশ করার জন্য বাবা-মায়ের কষ্টার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পড়াশোনা করেও শুধুমাত্র সরকারের আর পর্ষদ কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার জন্য তাদের ভবিষ্যত যে নষ্ট হল তার দায় কে নেবে? নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেছিলেন। তা হলে তিনি কি আইন জানেন না, নাকি ওটা জুমলা ছিল? এখন 'আমি জানি না'— বললেই কি তাঁর অপরাধ ঢাকা পড়ে?

২০১৪ টেট পরীক্ষায় প্রশ্ন ভুল ছিল বলে ২০১৮ সালে একটি মামলা হয়। পরে সেই নম্বর দেওয়া হয়। অভিযোগ এই নম্বর দেওয়া নিয়ম মেনে হয়নি। যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের নম্বর দিয়ে নিয়োগ করা হয়। ২০১৯ সালে রমেশ মালি নামে এক ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ, ২০১৪-র টেটে সুব্রত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ফেল করেও চাকরি পেয়েছেন। এমনকি সাদা খাতা জমা দিয়েও মোটা অঙ্কের কাটমানি দিয়ে চাকরি পেয়েছেন এমন অভিযোগও উঠেছে। এখানে 'বাগদার রঞ্জন'— এর কথা উঠে আসে। দ্বিতীয় দফার ১৬৫০০-র মধ্যে বাস্তবে কত নিয়োগ হয়েছে কেউ জানে না। আবার যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের কতজনের স্বচ্ছ মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়েছে তা কেউ বলতে পারবে না, কারণ পর্ষদ কোনও মেধা-তালিকাই তৈরি করেনি। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট দুর্নীতির অভিযোগে ২৬৯ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে এবং ২০১৪-র টেটে যে ৫৬ হাজার জন প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরি পেয়েছেন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নম্বর বিভাজন সহ তাদের যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছে। দুর্নীতির শিকড় কত গভীরে এই তথ্য প্রকাশ পেলেই তা উন্মোচিত হবে। ২০১৪-র টেটে হাজার কোটির দুর্নীতি হয়েছে বলে অনুমান।

এটা ঠিক যে কোনও নিয়োগে আবেদনকারী প্রার্থীদের সকলেরই নিয়োগ সম্পন্ন হয় না। কিছু প্রার্থী ওয়েটিং-এ থেকে শেষ পর্যন্ত বাদ যান। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য নিয়োগে যদি দুর্নীতি না হত, মেধাতালিকার ভিত্তিতে হত, তা হলে যারা আজ ফেল করে সাদা খাতা জমা দিয়েও শিক্ষকের পদে চাকরি পেয়েছে, তাদের জায়গায় আন্দোলনকারীরা সকলে রাস্তায় পড়ে না থেকে স্কুলে পড়াতেন। আন্দোলনকারীদের এই বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। এমনকি নবনিযুক্ত পর্ষদ সভাপতিও দুর্নীতির বিষয়ে সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের উত্তরে বলেই ফেললেন যে, তাহলে কি ২০১৪-র টেটে যে ৫৬ হাজার নিয়োগ হয়েছে তার সবটাই বিধি মেনে নিয়োগ পায়নি? কেউই তা বলছে না, কিন্তু পর্ষদ তো জানে এই ৫৬ হাজারের মধ্যে কতটা জল আছে! তার তালিকা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করছে না কেন? দুর্নীতি আর মিথ্যা ঢাকতে গিয়ে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক সম্মেলনে বারবার অসত্য কথা বলেছেন। ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে পর্ষদ সভাপতি সরকারের সংবেদনশীলতা বোঝাতে গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রী ২০ হাজার নিয়োগের কথা বলেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে ২০২০ সালে ১৬৫০০ পদ এবং বর্তমানে ১১ হাজারেরও অধিক পদ সৃষ্টি করলেন, যা মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০ হাজার পদের চেয়ে অনেক বেশি। পর্ষদ সভাপতি ভুলে গেলেন যে মুখ্যমন্ত্রী যখন ২০১৪-র টেট উত্তীর্ণদের জন্য ২০ হাজার পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন তখন ২০১৭ টেট পরীক্ষা হয়নি আর বর্তমানে যে ১১ হাজারের বেশি পদে নোটিফিকেশন বেরিয়েছে তা ২০১৪ ও ২০১৭ সহ সমস্ত টেট উত্তীর্ণদের জন্য। দুটো বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুখ্যমন্ত্রীর সংবেদনশীলতা বোঝাতে গিয়ে পর্ষদ সভাপতি ডাহা মিথ্যা তথ্য সাংবাদিক সম্মেলনে দিয়ে দিলেন। সরকারের উচিত ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী ২০১৪-র টেট নিয়োগ সম্পূর্ণ করা তারপর ২০১৭-র টেট উত্তীর্ণদের নিয়ম মেনে পদ তৈরি করে নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।

শুধু টেট নিয়োগেই নয়, এসএসসি, নার্স, পুলিশ কনস্টেবল, রাজ্য সরকারি গ্রুপ-ডি পদ, ডব্লিউবিসিএস সহ রাজ্যের প্রায় সমস্ত নিয়োগেই অভিযুক্ত রাজ্যের শাসকদল। বাগ কমিটির রিপোর্ট এই বিষয়ে একটি প্রামাণ্য দলিল। এমনকি এই রাজ্যে ক্ষমতায় না থেকেও কল্যাণী এইমসে নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুভাষ সরকার, বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা, রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে এবং এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও চলছে। শিক্ষক নিয়োগ সহ নিয়োগে দুর্নীতি আমাদের দেশে বা রাজ্যে এটাই প্রথম নয়। রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত একটা সময় ছিল যখন ম্যানেজিং কমিটির হাত ধরে নেতা ও মন্ত্রীদের স্পর্শপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা, আত্মীয় পরিজন, স্বজন, দলের কর্মীদেরই স্কুলে শিক্ষকের পদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়োগপত্র মিলত। এর জন্য বহু ক্ষেত্রেই দিতে হত মোটা টাকার ডোনেশন। ফলে বঞ্চিত হত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। বিগত সিপিএম সরকারের আমলে প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (পিটিটিআই) ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের কথা সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে। এনসিটিইকে এড়িয়ে সিপিএম সরকার নিজেদের মতো করে নিয়ম বানিয়ে রাজ্যে পিটিটিআই কলেজগুলো চালাতে থাকে। পরবর্তীকালে একটা মামলাকে কেন্দ্র করে এই দুর্নীতি ও বেআইনি কাজ প্রকাশ হয়ে পড়লে পিটিটিআই কলেজগুলোর স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে চাকরিপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

শুধু এই রাজ্য নয়, ত্রিপুরাতে ২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ১০৩২৩ জন শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল সেই রাজ্যের হাইকোর্ট (আনন্দবাজার পত্রিকা, আগরতলা ৮ মে ২০১৫)। গুজরাটে গত সাত বছরে নয়টি সরকারি নিয়োগ পরীক্ষার

আটের পাতায় দেখুন

টেট আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতাকে ধিক্কার

টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

২০১৪-তে প্রাথমিকে টেট-উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা ১৮ অক্টোবর থেকে সল্টলেকে যে আন্দোলনে নেমেছিলেন এবং যেভাবে তাঁরা আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন তা রাজ্যের শিক্ষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। অনশন ৮৩ ঘন্টা পেরনোর পর রাজ্য সরকার নৃশংসভাবে পুলিশ দিয়ে জোর করে অনশনকারীদের গ্রেফতার করে, যা সরকারের চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যেরই প্রকাশ। এই পুলিশি অত্যাচারে ইতিমধ্যে কয়েকজন অনশনকারীকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। আমরা আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সরকারের এই স্বৈরাচারকে ধিক্কার জানাই। সাথে সাথে আমরা দাবি করছি,

১) ২০১৪ ও ২০১৭-র টেট-উত্তীর্ণদের পুনরায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা চলবে না।

২) ২০১৪-র উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ওই সময়ে ঘোষিত শূন্যপদের ভিত্তিতে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে আগে নিয়োগ করতে হবে।

৩) ২০১৭-র উত্তীর্ণদের ২০১৭ সালে ঘোষিত শূন্যপদের ভিত্তিতে একই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করতে হবে।

৪) এই দুই নিয়োগ প্রক্রিয়া যতদিন সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন ওই প্যানেলের মেয়াদ শেষ করা চলবে না।

আমাদের আরও দাবি, এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখার সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

এর আগে ১৯ অক্টোবর আন্দোলনকারীদের আমরণ অনশন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দলের রাজ্য সম্পাদক একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি উপরোক্ত দাবিগুলি তুলে মন্তব্য করেন, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মধ্য দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের যে চাকরি দেওয়া হয়েছে তা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদই আদালতে স্বীকার করেছে। সেই অযোগ্য ব্যক্তিদের বরখাস্ত করা সরকারের প্রথম কাজ ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।

সিঙ্গুর আন্দোলন ছিল কর্পোরেট আগ্রাসন এবং সরকারের মালিক-তোষণ নীতির বিরুদ্ধে

২০২৩ সালে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট। সেই দিকে লক্ষ রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে বিজয়া সম্মিলনীতে ভাষণ দিতে গিয়ে সিঙ্গুর প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তোলেন। বস্তুত সিঙ্গুর এখন শাসক ও বিরোধী ভোটসর্বস্ব দলগুলির কাছে একটা রাজনৈতিক ইস্যু। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পমহলের আশীর্বাদ পেতে প্রমাণ করতে চাইছেন তিনি শিল্পবিরোধী নন। সিঙ্গুর আন্দোলনের পথ বেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও তাই আজ

এই বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়েছিল সারা দেশ

অতীতকে ভুলে যেতে চাইছেন। যদিও ভোটের আগে আবার তিনি এর কৃতিত্ব আত্মসাৎ করতে চাইবেন। উল্টোদিকে তৎকালীন শাসক সিপিএম নিজের গায়ের কৃষকবিরোধী দাগ তুলে ফেলতে এবং নিজেকে শিল্পপ্রেমী প্রমাণ করতে সে সময়েই অসার প্রমাণ হওয়া যুক্তিগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আবার তুলে আনছে। দেখাতে চাইছে সেদিনের লড়াইটা যেন শিল্প বনাম কৃষির ছিল।

সিঙ্গুরের লড়াইটা কি শিল্প বনাম কৃষি ছিল?

না। সিঙ্গুরের লড়াই ছিল এক বর্বর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, যার কল্যাণে কর্পোরেট একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা চাইলেই যে কোনও মানুষের জমি, ভিটেমাটি, বনজঙ্গল, প্রাকৃতিক যে কোনও সম্পদকে দখল করতে পারে, মানুষকে যথেচ্ছ উচ্ছেদ করতে পারে। শিল্পের বিরোধিতা সিঙ্গুরের কৃষকরা করেনি। তারা দাবি তুলেছিল, বহুফসলি উর্বর জমিকে শিল্পের নামে ধ্বংস না করে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী, পতিত, অকৃষি জমিতে শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে উঠুক। বন্ধ কলকারখানার হাজার হাজার একর জমি উদ্ধার করে সেখানে শিল্প গড়ুক সরকার। সরকারের কাছে সিঙ্গুরের মানুষের দাবি ছিল শ্রমনিবিড় শিল্প পরিকাঠামোর। তারা চেয়েছিল শিল্প গড়ার নামে অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার ফন্দি বন্ধ হোক। সেদিন সিঙ্গুর আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে এনেছিল— অত্যন্ত উর্বর বহুফসলি জমি অফুরন্ত নয়। এমন জমি গড়তে লাগে শত শত বছর, নষ্ট করা যায় একদিনে। সিঙ্গুর আন্দোলন সেদিন সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছিল, শিল্পায়নের ধুয়ো তুলে হাজার হাজার একর জমি একচেটিয়া দৈত্যাকার পুঁজির মালিকরা দখল করতে চাইছে একদিকে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার জন্য, অন্য দিকে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি ফসলের বাজারে নিজেদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েমের ধূর্ত পরিকল্পনায়। আর তার জন্য সরকার এত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টাটাদের জমি দিয়েছিল ৪৫ বছরে ৮০০০ টাকা একর হিসাবে। শর্ত ছিল, জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা সহ সব পরিকাঠামো বিনা পয়সায় দেবে সরকার। টাটারা বিদ্যুৎ পাবে ৩ টাকা ইউনিট দরে এবং তা ৫ বছর বাড়বে না। যদিও তখন পশ্চিমবঙ্গে গৃহস্থরা বিদ্যুতের দাম দিতেন প্রায় ৬ টাকা প্রতি ইউনিট। টাটাদের ভ্যাট, কর্পোরেট সার্ভিস ট্যাক্স, কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স সব মকুব হয়েছিল। ১ শতাংশ সুদে ২০০ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা ছিল। কথা ছিল তাও তারা শোধ করা শুরু করবে ২১ বছর পর থেকে। অর্থাৎ জনগণের ঘাড় ভেঙে আদায় করা ট্যাক্সের টাকাতেই ব্যবসা করবে টাটারা। টাকা জনগণের, লাভ টাটাদের!

সিঙ্গুরের মানুষ সেদিনই দাবি তুলেছিলেন, ১৮৯৪ সালের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের জমি অধিগ্রহণ আইন বদলাক সরকার। দাবি ছিল, জনস্বার্থে সরকারকে যদি কোনও জমি অধিগ্রহণ করতেই হয়, শুধু জমির মালিক নয়, বহু দশক ধরে যাঁরা জমির উপর নির্ভরশীল সেই ভাগচাষি ও খেতমজুরদের শুধু ক্ষতিপূরণ নয় তাদের যথাযথ পুনর্বাসন এবং জীবিকার সঠিক ব্যবস্থা করেই একমাত্র তা করতে হবে। সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার বলেছিল, টাটার মতো একচেটিয়া মালিকের লাভের জন্য জমি কেড়ে নেওয়াটাই জনস্বার্থ। কারণ তাতে নাকি কর্মসংস্থান হবে। দেশের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে। যদিও পরে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তথাকথিত জনস্বার্থের এই অজুহাত খারিজ হয়ে গেছে। আর নৈতিকতার দিক থেকে সিঙ্গুর প্রশ্ন তুলেছিল, অত্যাধুনিক মোটর গাড়ি শিল্পে ১০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে বড়জোর ৩০০ লোকের কাজ হতে পারে। তার জন্য এমন একটি জনবহুল এবং উর্বর কৃষি জমি এলাকাকে বেছে নেওয়া হবে কেন? প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করে কোন উপকারটি হবে? সরকার উত্তর দিয়েছিল, টাটার বাবু সাহেবদের বাগানের মালি, বাসনমাজার লোক, রান্নার লোক, জুতো পালিশের লোক লাগবে। ওটাও কর্মসংস্থান! সম্পন্ন চাষি এবং জমিতে সোনা ফলিয়ে সচ্ছল খেতমজুর-ভাগচাষিদের জন্য এমন শিল্প-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাই সরকার করেছিল! সিঙ্গুর তা ঘৃণায় ফিরিয়ে দিয়েছে।

নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ সিঙ্গুরে হল না কেন?

জনমনে এই প্রশ্ন তখন প্রবল ভাবে উঠেছিল যে, নন্দীগ্রামের মানুষ সরকারের প্রবল দমন-পীড়ন মোকাবিলা করে সালেমের জন্য জমির দখল নেওয়া প্রতিরোধ করতে পারলেও সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলন তা পারল না কেন?

২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ শুরু হবে জানতে পেরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বাংলা বনধের ডাক দেয়। প্রশাসন জমিতে বেড়া দিতে শুরু করলে দলের উদ্যোগে কৃষকরা ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব সেই প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। যদিও তাদের সমর্থকরা সরে থাকেননি। ফলে সশস্ত্র পুলিশ, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স সহ সিপিএম আশ্রিত ক্রিমিনাল বাহিনী চাষিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেদিন সিপিএম সরকারের প্রশাসন চাষিদের উপর যে নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনে তা দেখে সারা দেশের মানুষ শিউরে উঠেছিল। এই নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে ৩ ডিসেম্বর রাজ্যের সর্বত্র সড়ক অবরোধ করে ধিক্কার জানায় এস ইউ সি আই (সি)। ৫ ডিসেম্বর বাংলা বনধের ডাক দেয়। তা ব্যাপক ভাবে সফল হয়। এই ভাবে সিঙ্গুরের চাষিরা যখন জীবনপণ করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছেন তখনই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎই ৪ ডিসেম্বর সিঙ্গুর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে কলকাতার ধর্মতলায় অনশন করার কথা ঘোষণা করেন। এতেই তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা বুঝে যান দলনেত্রী সিঙ্গুরে প্রতিরোধ আন্দোলনে যাবেন না। নেত্রীর এই ভূমিকায় প্রতিরোধ সংগ্রামে ভাটা পড়ে। এই সুযোগে সিপিএম সরকার পুলিশি ঘেরাটোপে জমি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলে।

'রাজভবন চুক্তি' কারা ভেঙেছিল?

ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে আগস্ট ২০০৮, দীর্ঘ ২০ মাস তৃণমূল নেতৃত্ব সিঙ্গুর নিয়ে আন্দোলনের কোনও কর্মসূচি নেননি। তৃণমূল নেতৃত্বের এই ভূমিকায় বারবার হতাশাবাদ আন্দোলনে ছাপ ফেলেছে। এ অবস্থাতেও এস ইউ সি আই (সি) নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছে সংগ্রামী তেজে সিঙ্গুর আন্দোলনকে দাঁড় করাতে। এই পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রামের ধারায় আন্দোলন গড়ে তুলতে এস ইউ সি আই (সি) তৃণমূল নেত্রীকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে লাগাতার অবরোধের প্রস্তাব দেয়। তাঁর পার্টি অতটা সুসংগঠিত নয়, এই কথা বলে তৃণমূল নেত্রী প্রথমে রাজি না হলেও পরে মাত্র দু'দিনের জন্য রাজি হন। এস ইউ সি আই (সি) প্রথম দিন থেকেই এই কর্মসূচিতে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে। এবং এস ইউ সি আই (সি)-র পরিকল্পনাতেই ধরনা লাগাতার রূপ নেয়। অষ্টম দিনে তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস

চারের পাতায় দেখুন

জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২-এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় গ্রাহক সভা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা, খনি, রেল, বিমান, ব্যাঙ্ক, বিমা সহ বিদ্যুৎ শিল্পকেও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। বিগত এনডিএ সরকারের সময়ে বিদ্যুৎকে পরিষেবা থেকে পণ্যে পরিণত করার জন্য তৈরি হয়েছিল জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩। এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আদানি, আম্বানি, গোয়েঙ্কা, টাটা, এসার, টরেন্টো— এইসব কোম্পানিগুলো মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশ গ্রাস করেছে।

দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাও এইসব কোম্পানিগুলো দখল করেছে। যার বিষময় ফলে ওড়িশা, দিল্লি সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের গ্রাহকরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের পরিষেবা দেওয়ার চূড়ান্ত অবহেলার কারণে খোদ সেই রাজ্যের সরকার বাধ্য হয়েছে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স বাতিল করতে।

বর্তমান বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে বিদ্যুৎ আইনকে সংশোধন করে বিদ্যুৎ বিল-২০২২ এনেছে। এই বিলের মাধ্যমে দেশের সমস্ত রাজ্যের বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাকে ঐ সব পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। স্মার্ট প্রিপেড মিটার বসিয়ে গ্রাহকদের টাকাতেই এরা ব্যবসা করবে এবং সর্বোচ্চ মুনাফার আশায় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করবে নিজেদের খুশি মতো। সরকারি সংস্থায় যারা বর্তমানে চাকরি করছেন তারা পরিণত হবেন ওই সব কোম্পানির শ্রমিকে। এর বিরুদ্ধে দেশের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গঠিত হয়েছে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইইসিএ)।

১৭-১৮ অক্টোবর অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় বৈঠক হয়ে গেল কলকাতায়। ১৫টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৭ অক্টোবর প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য স্বাগত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। সভায় উপস্থিত থেকে এই গ্রাহক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন প্রখ্যাত গণসংগীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ গুহ, পরিবেশবিদ প্রদীপ দত্ত প্রমুখ। শারীরিক কারণে উপস্থিত হতে না পেরে লিখিত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন কলকাতা ও বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল কুমার সেনের রেকর্ড করা বক্তব্য শোনানো হয়।

প্রতিনিধিরা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ফিরে গেছেন তাদের রাজ্যে ব্যাপক গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে। আগামী ৮-৯ এপ্রিল ২০২৩ মধ্যপ্রদেশের ভূপালে সর্বভারতীয় বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সিঙ্গুর আন্দোলন

তিনের পাতার পর

ঘোষ বক্তৃতা দেন। এক্সপ্রেস ওয়ে অবরোধ সরকারের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করে। ১৫ দিনের ধরনা চলাকালে সিপিএম সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের মধ্যস্থতায় সরকার পক্ষ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে 'রাজভবন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। বলা হয়, 'যে কৃষকরা জমির বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ নেননি তাঁদের দাবিতে সাড়া দিয়ে বেশিরভাগ জমি প্রকল্প এলাকার মধ্য থেকে এবং বাকি

বাজেমেলিয়া হাসপাতাল মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। ৩ নভেম্বর ২০০৬

জমি লাগোয়া এলাকা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।' চুক্তির পর ধরনা প্রত্যাহৃত হয়।

কিন্তু তারপরই টাটারা ঘোষণা করল, প্রকল্প এলাকা থেকে এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়া যাবে না। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে ঘোষণা করলেন টাটা প্রকল্পের ভিতর থেকে জমি ফেরত দেওয়া যাবে না। এ ভাবে চুক্তির কালি শুকোবার আগেই সিপিএম সরকার তা ভঙ্গ করার নজির রাখল। গোটা বাংলা এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ধিক্কারে ফেটে পড়ল। জেলায় জেলায় এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে চুক্তি কার্যকর করার দাবিতে বিক্ষোভ চলতে থাকল। ১৬ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরে এক সভায় এস ইউ সি আই

সিঙ্গুরের কৃষক প্রতিরোধ সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে

(সি) নেতা কমরেড সৌমেন বসু বললেন, চুক্তিভঙ্গকারী এই সরকারের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই। সিপিএম টাটাদের সাথে যোগসাজশে কৃষক-খেতমজুর-বর্গা চাষিদের সঙ্গে প্রতারণায় নেমেছে। আপনারা সর্বাত্মক প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হোন।

আন্দোলনের মুড দেখে টাটা গোষ্ঠী যখন বুঝল সিঙ্গুরের চাষিদের এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতিরোধ মোকাবিলা করে সিপিএম সরকার তাকে জমি পাইয়ে দিতে পারবে না, তখন ৩ অক্টোবর ২০০৮ তারা ঘোষণা করল সিঙ্গুর ছেড়ে তারা চলে যাচ্ছে। অবশ্য ইতিমধ্যে তলে তলে টাটারা গুজরাটে বিজেপি সরকারের সঙ্গে আরও সুবিধাজনক শর্তের আশ্বাস আদায় করে নিয়েছিল।

সিঙ্গুর থেকে গুজরাটের সানন্দে ন্যানো কারখানা যাওয়ার পর সেখানের অবস্থা কী?

জমিদাতা উত্তর কোটপুরা, ছিরোরি সহ সাতটি গ্রামের মানুষের কিছুই জোটেনি। প্রথম কিছুদিন ৬ থেকে ৭ হাজার টাকায় টাটার কারখানায় তাদের কাজ জুটেছিল। এখন টাটারা স্থানীয়দের আর নেয় না। বেশিরভাগ কর্মীই সেখানে কন্ট্রাকচুয়াল। তাদের গড় বেতন ১০ হাজার টাকার বেশি নয়। যে জমি দিয়ে গ্রামের মানুষ ২০ লক্ষ টাকা পেয়েছে বলে বিজেপি প্রচার করে, সেই জমি এখন প্রোমোটাররা বেচছে ৫ কোটি টাকায়। গ্রামের মানুষের পানীয় জল, বিদ্যুৎ নেই। নর্মদা নদীর জল টাটার উপনগরীতে পৌঁছালেও গ্রামের বাসিন্দাদের সে জল পাওয়ার রাস্তা বন্ধ। কোটপুরার ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলও বন্ধের পথে। কারণ স্থানীয় বাসিন্দারা বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লিখিয়েছেন (এনডি টিভি, ৩ ডিসেম্বর, ২০১৭)। সানন্দে যে ন্যানো কারখানা হল, কেন তাতে আজ লালবাতি জ্বলছে? কেন জামসেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানাতেও উৎপাদন শক্তিকে অলস করে রাখতে হচ্ছে? উৎপাদনের শিফট কমাতে হচ্ছে? তবুও সিপিএম নেতারা পুরনো বুলিই আওড়ে যাচ্ছেন।

সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলন কি শিল্প বিরোধী ছিল?

শিল্পের জন্য জমি প্রয়োজন। কিন্তু জমি পেলেই কি শিল্পপতিরা শিল্প করে? রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের তথ্য বলছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যে ৫৮৩টি সংস্থাকে গড়ে ৫.৯ একর, অর্থাৎ ৬ একর করে জমি দেওয়া হয়েছে (আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৮-০২-২০২১)। কটা শিল্প তারা করেছে? সিপিএম আমলে রাজ্যে ৫৬ হাজারেরও বেশি কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে। এখন তা আরও ১০ হাজার বেড়েছে। ২০১৯ সালের ২ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় জানিয়েছিল, সারা দেশে ৬ লক্ষ ৮০ হাজারেরও বেশি রেজিস্টার্ড কারখানা বন্ধ। মহারাষ্ট্রে বন্ধ ১ লক্ষ ৪২ হাজার কারখানা, দিল্লির আশপাশ মিলিয়ে বন্ধ ১ লক্ষ ২৫ হাজার কারখানা। গুজরাটে বন্ধ ৩০ হাজারের বেশি। এ সব কারখানা কি আন্দোলনের জন্য বন্ধ হয়েছে? স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ) -এর জন্য অধিগ্রহণ করা ৫৯ হাজার একরেরও বেশি জমি অব্যবহৃত পড়ে আছে। শুধু গুজরাটেই সেজের জমি পড়ে আছে ১৫ হাজার ৬৪২ একরেরও বেশি। সেগুলিতে শিল্প হয়নি কেন? পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বন্ধ কারখানার জমি ছাড়াও অনুর্বর এবং এক ফসলি জমিতে শিল্প হতে পারে। অনুর্বর এলাকার চাষি এবং জমিতে বসবাসকারী সমস্ত পরিবারকে উপযুক্ত দাম, জীবন-জীবিকার গ্যারান্টি সহ সঠিক পুনর্বাসন দিলে, শিল্পে নিয়োগের সুযোগ দিলে তারা জমি দেবে না এমন কথা শোনা যায়নি। বরং জমি পেয়েও শিল্পপতিরা শিল্প গড়েনি। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দালরা ৫ হাজার একর জমি নিয়ে ফেলে রেখেছে। বেশিরভাগ শিল্পপতিরই জমি নিতে যতটা আগ্রহ, শিল্প গড়তে তার কানাকড়ি পরিমাণও দেখা যায়নি। আসলে শিল্পায়নের নামে বেশি বেশি জমি পুঁজিপতিরা পেতে চায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য। শিল্পায়নের ধুয়ো তুলে এ হল জমি হাতানোর এক ধূর্ত কৌশল।

শিল্পসঙ্কটের মূল কারণ কী?

শিল্পসঙ্কটের প্রধান কারণ, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটির নিজস্ব সঙ্কট— বাজারসঙ্কট। অর্থাৎ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাব। বর্তমানে খাদ্যপণ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার খরচ ইত্যাদি এত বেশি যে, সিংহভাগ মানুষের শিল্পপণ্য কেনার সামর্থ্য নেই। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে মাত্র ৮ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কিছু ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা আছে। এইটুকু ক্রয়ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কি লাগাতার শিল্পায়ন হতে পারে? জনগণের এই আর্থিক দুর্দশা তৈরি হয়েছে এবং বেড়ে চলেছে পুঁজিবাদের শোষণ-বঞ্চনার নিয়মেই।

তা হলে পুঁজিবাদের এই মুমূর্ষু স্তরে শিল্পায়ন কর্মসংস্থানের যে সঙ্কট তার সমাধান কোথায়?

পুঁজিবাদের এই মুমূর্ষু স্তরে আঠারো-উনিশ শতকের মতো ব্যাপক শিল্প হতে পারে না। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত একটা দুটো শিল্প এখানে সেখানে হতে পারে। এ যুগে শিল্পপতিরা শ্রমিকনির্ভর শিল্প বন্ধ করে যন্ত্রনির্ভর শিল্প গড়ায় খুবই তৎপর। কারণ তাতে পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ে বিপুল হারে, কিন্তু সঙ্কুচিত হয় কাজের সুযোগ। এই যে সমস্যা— এর সমাধান পুঁজিবাদী রাস্তায় নেই। সেজন্যই তো পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রাম। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম। এই কঠিন কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজটি বাদ দিয়ে হবে না। একে এড়িয়ে আজ শিল্পায়ন-কর্মসংস্থানের সঙ্কট সমাধান করা যাবে না।

জীবন পণ করে প্রতিরোধ গড়েছিলেন সিঙ্গুরের কৃষকরা

সিঙ্গুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য

একের পাতার পর

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার চাইতে বেশি সুযোগ-সুবিধা এবং বেশি জমি দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তাদের নিজেদের স্বার্থে সিঙ্গুরের জমি নিজেদের দখলে রেখেই গুজরাটে চলে যায়। যদিও ন্যানো গাড়ির কারখানা সেখানেও বাজার না পাওয়ায় টাটাকে তা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করতে হয়।

এই সত্য কাহিনী বলতে আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভীত। কারণ, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গত ১১ বছর ধরে অবাধে অপশাসন, ঘুষ, দুর্নীতি, খুনোখুনি, কাটমানির কারবার চলার ফলে জনগণের কাছে তিনি ও তাঁর সরকার ধিক্কৃত। তাই আজ কর্পোরেট মালিকদের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ক্ষমতায় থাকার তিনি আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছেন না। আদানি, টাটা সহ সমস্ত কর্পোরেট মালিকরাই আজ তাঁর অত্যন্ত আপনজন। তাই শিলিগুড়িতে সিঙ্গুর থেকে টাটাদের না তাড়ানোর দাবি আসলে তাঁর সরকারের জনগণকে লুণ্ঠনকারী টাটা সহ কর্পোরেট পুঁজিপতিদের তোয়াজ করার মানসিকতারই প্রকাশ।

আসামে জেলায় জেলায় যুব সম্মেলন

গত সেপ্টেম্বরে এআইডিওয়াইও-র আহ্বানে আসামের চারটি জেলায় যুব সম্মেলন প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বেকার সমস্যার সমাধান, চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত হারে বেকারভাতা প্রদান, সরকারি শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ, বেকার সমস্যা সমাধানে রাজ্যে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলা প্রভৃতি দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

গোয়ালপাড়া ঃ ১৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত গোয়ালপাড়া জেলা সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর। মনোয়ার হুসেন ও আব্দুস সালামকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৩ সদস্যের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

দক্ষিণ শালমারা মানকাচর ঃ একই দিনে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলা সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির সহসভাপতি জিতেন চালিহা এবং রাজ্য সম্পাদক বিরিঞ্চি পেগু। ১৯ সদস্যের নবগঠিত জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে দেওয়ান মুনসের ও আবুল কাসেম।

করিমগঞ্জ ঃ ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত করিমগঞ্জ জেলা সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন নিরঞ্জন নস্কর। দেবাংশু নাথকে সভাপতি ও গোলাপ কুমারকে সম্পাদক করে ১৩ সদস্যের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ধুবুরি ঃ ২৫ সেপ্টেম্বরের ধুবুরি জেলা সম্মেলনে (ছবি) বক্তব্য রাখেন নিরঞ্জন নস্কর ও বিরিঞ্চি পেগু। জহুরুল হক চৌধুরীকে সভাপতি ও সুমন আহমেদকে সম্পাদক করে ১৩ সদস্যের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিটি সম্মেলনেই যুবসমাজের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আধারে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে এআইডিওয়াইও-কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। ২০ সেপ্টেম্বর সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে শিলচর শহরে যুব-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়।

গুজরাটে কৃষি-আইন বাতিল হল না কেন
সোচ্চার এআইকেকেএমএস

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের চাপে কৃষি-আইন বাতিল ঘোষিত হলেও গুজরাটে তা বাতিল করেনি বিজেপি সরকার। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিল-২০২২ পার্লামেন্টে পেশ হয়েছে। এটা আন্দোলনকারীদের প্রতি একটি প্রতারণা। অবিলম্বে তা প্রত্যাহার এবং প্রতিশ্রুতি মতো এমএসপি সুনিশ্চিত করার দাবিতে এআইকেকেএমএস-এর গুজরাট রাজ্য ইউনিট ২২ অক্টোবর সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক কানুভাই খাদাদিয়া, জয়দীপভাই খুমন, নরেশভাই খুমন প্রমুখ।

নারী নিরাপত্তার দাবিতে ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভ

উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে এক মহিলাকে গণধর্ষণ ও যৌনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে নৃশংস নির্যাতন নির্ভয়া কাণ্ডের বীভৎসতার ভয়াবহ স্মৃতি ফিরিয়ে আনল। প্রধানমন্ত্রী 'বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও' স্লোগান দিয়ে চলেছেন, এদিকে দেশ জুড়ে প্রতিদিন অসংখ্য নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। হরিদেবপুরে অপহরণ করে ধর্ষণের ঘটনা উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

দুটি ঘটনাতেই দ্রুত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ২০ অক্টোবর দেশ জুড়ে প্রতিবাদের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর ডাকে ছাত্র-যুব-মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে (ছবি) ব্যাপক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

অবিলম্বে সিএনজি এবং পাইপলাইন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার, এগুলির উপর থেকে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের চাপানো জিএসটি তুলে নেওয়া প্রভৃতি দাবিতে ১০ অক্টোবর ত্রিপুরার আগরতলায় এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

বিদ্যুতে স্মার্ট প্রিপেড মিটার
আন্দোলনে পিছু হটল আসাম সরকার

বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো এখন প্রিপেড মিটার বসানোর জন্য তোড়জোড় করছে। জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল (২০২২)-এ পরিষ্কার বলা আছে প্রায়র গ্যারান্টি অফ রেভিনিউ ব্যতীত বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। অর্থাৎ গ্রাহকদের স্মার্ট প্রিপেড মিটারের মাধ্যমেই বিদ্যুৎ নিতে হবে, কারণ এটাই একমাত্র প্রায়র গ্যারান্টি অফ রেভিনিউ। গ্রাহকদের কানেকশনের লোডকে ভিত্তি করে আগে টাকা জমা দিতে হবে, তারপর মিটারে বিদ্যুৎ সংযোগ হবে। মিটারে টাকা শেষ হবার পূর্বেই মোবাইলে মেসেজ আসবে। আবার টাকা না জমা করলে বিদ্যুৎ সংযোগ আপনা-আপনি বিচ্ছিন্ন হবে। অর্থাৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে আগে টাকা আদায় করে সেই টাকা দিয়েই বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা ব্যবসা করবে।

এই জনবিরোধী বিল সংসদে পাশ হবার আগেই কয়েকটি রাজ্যে স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো শুরু হয়েছে। আসামে বিজেপি সরকার এ বিষয়ে অনেক দূর এগিয়ে। স্মার্ট মিটার প্রিপেড বা পোস্ট পেড দুই রকমই হয়। আসামে স্মার্ট মিটারকে কেন্দ্র করে কিছুদিন ধরে নানা অভিযোগ উঠছে। গত ২-৩ মাস ধরে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিকভাবে বেড়েই চলেছে। কোথাও কোথাও ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি হয়েছে। মাসে ২ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১৫ হাজার টাকার বিলও হয়েছে। গ্রাহকদের অভিযোগ স্মার্ট মিটার লাগানোর পরই বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল) তা মানতে চায়নি।

১৬ সেপ্টেম্বর (এপিডিসিএল) বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, গরমের ফলে ও বৃষ্টি কম হওয়ায় বিদ্যুতের ব্যবহার বেশি হয়েছে এবং তার ফলেই নাকি বিল বেশি হয়েছে। তাছাড়া তারা জানায় এফপিপিসিএ (ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার পারচেজ কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) এর জন্য প্রতি ইউনিটে ৩০ পয়সা করে নেওয়া হচ্ছে যা গ্রাহকদের বিলকে কিছুটা বাড়িয়েছে। এদিকে আসাম ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, গত মার্চ মাসের পর কোনও মাশুল বৃদ্ধি হয়নি। প্রশ্ন গ্রাহকদের, তা হলে এই অস্বাভাবিক বিল হচ্ছে কেন?

অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য গরমের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার একটু বেশি হলেও বিল ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি অস্বাভাবিক। এর প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে দিনের পর দিন চলতে থাকে গ্রাহকদের প্রতিবাদ, অবস্থান বিক্ষোভ হয়। আন্দোলনকে বিপথগামী করতে রাজ্যের তথ্য-জনসংযোগ ও পরিষদীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা দাবি করেন সরকারি কর্মীদের প্রতি মাসে মাইনে বাড়ে, তাই বিদ্যুতের মাশুলও বাড়তেই পারে। কিন্তু এসব কথায় গ্রাহকদের আন্দোলন থামানো যায়নি। প্রবল সমালোচনার সামনে পড়ে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, নতুন করে লাগানো স্মার্ট মিটারগুলির ত্রুটিপূর্ণ রিডিং-এর কারণেই বিলের অঙ্ক বেড়েছে এবং সমস্ত মিটার পরীক্ষা ও পরিবর্তন করা হবে। এটা গ্রাহক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ জয়।

আসামের বিদ্যুৎ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এক ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এপিডিসিএল-এর বিলিং প্রক্রিয়ার প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্যই বিল অস্বাভাবিক বেড়েছে। আসামে মোট ৬৫ লাখ গ্রাহকের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩ লাখ স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যা প্রিপেড মিটার। অথচ অস্বাভাবিক বিল এসেছে স্মার্ট নির্বিশেষে। এপিডিসিএল অত্যন্ত অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স সফটওয়ার ক্রয়ের টেন্ডার সম্পন্ন করে এবং কলকাতার সিংহাল উদ্যোগ ও এনভিল কেবল কোম্পানিকে এই কাজের দায়িত্ব দেয়। বিল প্রস্তুত প্রক্রিয়ার জন্য সিংহাল উদ্যোগকে মাসে ৩৩ লাখ টাকা দিচ্ছে এপিডিসিএল, এদের অদক্ষতা ও দুর্নীতির জন্যই এসব হচ্ছে। তিনি এপিডিসিএল-এর বিলিং প্রক্রিয়ার আই টি তদন্তের দাবি জানান।

অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এএইসিএ) এসবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে যে, পুরোনো ডিজিটাল মিটারে কোনও ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ বিভাগ একটি বেসরকারি সংস্থার সাথে মাসে ৩৩ লাখ টাকার চুক্তি করে স্মার্ট মিটার প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করে। স্মার্ট মিটার গ্রাহকদের মোবাইল ফোনে বিলের মেসেজ সরাসরি পাঠিয়ে দেয়। ফলে গ্রাহকদের ঘরে ঘরে গিয়ে মিটার চেক করার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মেসেজে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয় না, যা বিলে দেওয়া হত। ফলে গ্রাহকরা জানতে পারেন না যে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করেছেন তিনি। এভাবে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পকেট কাটা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র গ্রাহক আন্দোলনে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইইসিএ)।

পাঠকের মতামত

হিন্দি প্রেমের আড়ালে জ্ঞানচর্চা বন্ধের পরিকল্পনা

গত কয়েকদিনের সংবাদপত্র থেকে জানতে পারলাম, হিন্দি ভাষার গুরুত্ব বাড়ানোর প্রস্তাব ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করেছে।

এই খবর থেকে জানতে পারলাম, ১) আই আই টি, আই আই এম, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষাদানের ভাষা এবং অন্যান্য কাজকর্মের ভাষা হিন্দি হওয়া বাঞ্ছনীয়, ২) সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক ইংরেজি পেপার তুলে দিয়ে হিন্দি পেপার আনা দরকার, ৩) স্কুলে, কলেজে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের ভাষা হিসাবে হিন্দি আবশ্যিক হওয়া দরকার। সে ক্ষেত্রে ইংরেজির ব্যবহার ঐচ্ছিক করা হোক। ৪) দেশের সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজকর্মের ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, ৫) যেসব রাজ্যে সরকারি ভাষা হিন্দি সেখানে হাইকোর্টের কাজ হিন্দিতে করা বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের ভাষা হিন্দি হওয়া উচিত। এছাড়া আরও অনেক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

খবরটা পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি! প্রথমত, এটা ব্যাখ্যা করার কোনও প্রয়োজন নেই যে, আমরা চাই বা না চাই জ্ঞানচর্চা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরেজি ভাষা। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা এবং সংযোগকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্ব আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, আই আই টি সহ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার লঘু করলে সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের মেধাশক্তি মুখ থুবড়ে পড়বে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আজও যে ভারতীয়রা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে কর্মরত বলে আমরা গর্ব করি তা ভূলুণ্ঠিত হবে।

তৃতীয়ত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চস্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষায় সমস্ত বই পাওয়া কি বাস্তবে সম্ভব? তা হলে উচ্চশিক্ষায় এ দেশের ছেলেমেয়েরা কী ভাবে অংশগ্রহণ করবে?

চতুর্থত, বিশ্বজুড়ে নিত্যনতুন ওষুধপত্র থেকে আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর সভ্যতার বিভিন্ন আবিষ্কার, সে সব ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। স্কুলস্তর থেকে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব কমিয়ে দিলে চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার অগ্রগতি স্তব্ধ হবে।

পঞ্চমত, আইনের সমস্ত বইপত্র হিন্দি ভাষায় পাওয়া কি সম্ভব? হাইকোর্টের মতো প্রতিষ্ঠানে হিন্দি ভাষা বাধ্যতামূলক হলে বিচার ব্যবস্থা সঠিকভাবে চলবে তো?

দেশ জুড়ে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার এই পরিকল্পনা যে আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উগ্র হিন্দুত্ববাদ প্রসারের ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ তা উল্লেখ করে দেশের প্রথম সারির শিক্ষাবিদরা ইতিমধ্যেই এর বিরোধিতায় সোচ্চার হয়েছেন। আসুন আমরাও এই পরিকল্পনা বাতিলের দাবি তুলি।

বাসুদেব দাস
ডহরপুর, তমলুক

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে
জঙ্গিপুরে ডেপুটেশন

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ওষুধ ছাঁটাই, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ, এন এম সি বিলের সুপারিশ অনুযায়ী মেডিকেল শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ, স্বাস্থ্যসাথীর নাম করে বিমানির্ভর সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বিরোধিতা সহ জনস্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন দাবিতে ২০ অক্টোবর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, মুর্শিদাবাদ জেলার পক্ষ থেকে জঙ্গিপুরে মহকুমা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

নেতৃত্বে ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাঃ রবিউল আলম, মহম্মদ মতিউর রহমান, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের সুমন পাল, পীযূষ রায়, মেয়াজ শেখ প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদে কমসোমলের জেলা ক্যাম্প

মুর্শিদাবাদ জেলা কমসোমলের উদ্যোগে দৌলতাবাদের ছয়ঘরী গার্লস হাই মাদ্রাসাতে শতাধিক কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে ১৫-১৬ অক্টোবর একটি জেলা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পের শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এসইউসিআই(সি)-র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী। ক্যাম্পে খেলাধূলা, পিটি-প্যারেড ছাড়াও নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক সাধন রায়, কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ভোটের খরচ দেয় পুঁজিপতিরাই

একের পাতার পর

কী দেবে তার লম্বা ফিরিস্তি দেয়। কিছু কিছু ‘উপহার’ আগাম হাতে হাতেও মিলে যায়। তা হলে তারা এই টাকা পায় কোথা থেকে?

পায় শিল্পপতি-পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের থেকে। কিন্তু তারা কেন এদের টাকা দেয়? দেয়, কারণ এই সব দলগুলি ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসার পর এদেরই ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত দাবিগুলিকে কার্যকর করে। যেমন, শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের ট্যাক্স কমিয়ে দেয়, তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে দেয়, সরকারি সম্পদ, সম্পত্তি, শিল্প, সংস্থা— সব জলের দামে, বিনা দামে তাদের হাতে তুলে দেয়। সরকারি টেন্ডার, অর্ডারগুলি পাইয়ে দেয়।

উল্টোদিকে, সাধারণ মানুষকে এই দলগুলি যে প্রতিশ্রুতি দেয় তার কোনওটিই তারা রক্ষা করে না। যেমন, সবচেয়ে উঁচু গলায় যে দাবি তারা করে তা হল, জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি রোধ করবে, বেকারদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে, দুর্নীতি বন্ধ করবে, জনগণের উপর চাপানো কর কমিয়ে দেবে— এমনই আরও সব। বাস্তবে এই সব প্রতিশ্রুতির কোনওটিই তারা রক্ষা করে না শুধু নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে একেবারে উল্টো আচরণ করে। যেমন জিনিসের দাম কমানোর কোনও চেষ্টাই তারা করে না, উপরন্তু যে সব নীতি নেয় তাতে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়ে। ব্যবসায়ীরা অন্যায় ভাবে, বেআইনি ভাবে দাম বাড়ালেও সরকার চুপ করে থাকে। চাকরির ব্যবস্থা দূরে থাক, এমন নীতি নেয় যাতে মালিকরা অবাধে ছাঁটাই করতে পারে। সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ করে। যতটুকু নিয়োগ করে তা অস্থায়ী এবং চুক্তির ভিত্তিতে। চাকরি শেষে যে সুযোগ সুবিধাগুলি শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওয়ার কথা সেগুলি বন্ধ করে দেয়। দুর্নীতি দূর করা দূরের কথা, ক্ষমতায় বসে জনগণের সম্পত্তি অবাধে লুঠ করতে থাকে। ট্যাক্স কমানোর পরিবর্তে নানা অছিলায় আরও ট্যাক্স চাপাতে থাকে, অন্য দিকে পুঁজিপতিদের ট্যাক্স ছাড় করে দেয়।

আজ জনগণকে এটা বুঝতে হবে যে, ভোটের সময় এই বিপুল পরিমাণ খরচ যে এই দলগুলি করে তার একমাত্র উদ্দেশ্য জনগণকে ভুলিয়ে, প্রতারিত করে তাদের থেকে ক্ষমতায় বসার ছাড়পত্রটি আদায় করে নেওয়া। এবং এই খরচ জোগায় সেই পুঁজিপতি শ্রেণি, শাসক দলগুলি ক্ষমতায় গিয়ে যাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে। জনগণকে আজ এটাও বুঝতে হবে, কোনও দল যদি সত্যিই জনস্বার্থকে প্রতিফলিত করে তবে তারা কোনও ভাবেই পুঁজিপতিদের থেকে টাকা নিতে পারে না। কারণ পুঁজিপতিদের টাকা নিলে, সেই টাকায় ভোট করলে, সেই ভোটে জিতে পুঁজিপতিদের শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধতা করা যায় না। একটু খেয়াল করলেই যে কেউ বুঝবেন, পুঁজিপতিদের টাকায় পরিচালিত এই দলগুলি কেউই সেই বিরুদ্ধতা করে না। তাই আজ এটাও স্পষ্ট বুঝতে হবে যে, জনগণের স্বার্থে যে দল কাজ করে তাদের ভোটের খরচ জোগানো, জনস্বার্থে গড়ে তোলা আন্দোলনগুলির খরচ জোগানোর দায়িত্ব অন্যে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণি, পালন করতে পারে না, জনগণকেই তাদের নিজেদের স্বার্থে সে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার প্রবীণ সদস্য কমরেড নদীরাম বৈদ্য ২৯ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

’৬০-এর দশকে তেভাগা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি প্রয়াত কমরেড রাধানাথ হালদারের সান্নিধ্যে এসে দলের সাথে যুক্ত হন। খুব গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তৎকালীন সময়ে জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পিছপা হননি। বিশেষ করে খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করার কারণে জমিদাররা তাঁকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা সত্ত্বেও ওই আন্দোলনে জমিদারদের মাথা নিচু করতে বাধ্য করেন তিনি। ১৯৯৩ সালে কমরেড বৈদ্য রাধাকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন।

পরবর্তী সময়ে নিরহংকারী, সদাহাস্যময় এই মানুষটি নিজের এলাকায় জননেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিজগুণে আপন করে নিতে পারতেন। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে দলের লোকাল কমিটির সদস্যপদে উন্নীত হন তিনি। ১৯৯৮ সালে পুনরায় পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। বয়সে অনেক ছোট লোকাল সম্পাদককে নেতা হিসাবে মানার ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছিল না তাঁর। জীবিকার প্রয়োজনে যেখানে গিয়েছেন সেখানে দলের কথা এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের কথা বলতেন। তাঁর পরিবার-পরিজনকে দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দলমত নির্বিশেষে কয়েকশো মানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গুণসিন্ধু হালদার ও কমরেড রেণুপদ হালদার। এ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এবং স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন জনপ্রিয় নেতাকে হারাল।

কমরেড নদীরাম বৈদ্য লাল সেলাম

বিশ্ব ক্ষুধা তালিকায় ১০৭-এ ভারত

রেশনে খাদ্য বন্ধের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের

করোনা অতিমারির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য রেশনের মাধ্যমে বিলি করছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তা বন্ধ করবে বলে শোনা যাচ্ছে। সরকারি যুক্তি, লকডাউন শেষ হয়ে গেছে, কর্মক্ষেত্রগুলি খুলে গেছে, ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা আর তেমন নেই। তারা এও বলছে, এ বছর গম ও ধান, দুটোরই উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় খাদ্য ভাণ্ডারে টান পড়েছে। তাই দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠেছে, কোনটা সত্য? প্রয়োজন নেই, নাকি উৎপাদন হচ্ছে না?

প্রয়োজন না থাকার অজুহাতে এই অর্থবর্ষে 'অন্ন যোজনা' প্রকল্পের বরাদ্দ টাকার পুরোটা কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করেনি। এই অবস্থায় দেখা যাক, এই প্রকল্পের এখন আর দরকার আছে কি নেই? সরকারি-অসরকারি নানা সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, দরকার অত্যন্ত বেশি রকমের। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ খেতে পান না দু'বেলা। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২১-এ ভারতের স্থান ছিল ১০১। এখন তার থেকে আরও অন্ধকারে ভারত, ২০২২-এ ১২১টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১০৭। দেশের ৮০ কোটিরও বেশি মানুষ রেশন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে দিন যাপন করেন। তা হলে রেশন ব্যবস্থায় কোপ কেন?

গত জুলাই মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতে ২০১৮-২০ সালের তুলনায় ২০১৯-২১ সালে ক্ষুধা ও অপুষ্টির প্রকোপ বেড়েছে। গত দু'বছরে অন্তত ৫৬ কোটি ভারতীয় খাদ্য নিরাপত্তার অভাবে ভুগেছেন, যা দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের আর এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ৯৭ কোটি ভারতীয় সুষম আহার থেকে বঞ্চিত। তা হলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নেই, মন্ত্রীরা কীসের ভিত্তিতে তা ঠিক করলেন?

তাছাড়া লকডাউন উঠে গেলেও কাজ ফিরে পাননি একটা বড় অংশ, বেকারির হার ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ। সিএমআইই ২০২২-এর মে মাসে জানিয়েছে, নতুন করে ১ কোটি ৪০ লক্ষ কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন। এতে প্রকাশ, আগস্টে বেকারত্বের হার বেড়ে শহরে দাঁড়িয়েছে ৯.৭ শতাংশ, গ্রামে ৭.৬ শতাংশ। যারা কাজ খুঁজতে গিয়ে পাননি বেকারত্বের এই হিসাব সেটা ধরে। আর যারা কাজ করতে সক্ষম, তাদের ধরলে জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ পুরোপুরি রোজগারহীন। ৪৭ শতাংশ মাত্র কিছু কাজ পায়। আয় কমেছে বহু মানুষের।

বেশিরভাগ কাজ অসংগঠিত ক্ষেত্রের। মজুরি অনেকেরই দিনে ২০০ টাকারও কম। এদিকে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে চড়চড় করে। ফলে ক্রয়ক্ষমতা কমছে মানুষের। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য কিনতে পারছে না তারা। নিত্যপ্রয়োজনীয় চাল-গম-ডাল-তেল-সবজি-আলু কিনতে তাদের হিমসিম অবস্থা। খুচরো বাজারে ডালের দাম গত ১০৫ মাসের মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। কোনও বেসরকারি সংস্থা নয়, সরকারি হিসাব বলছে দেশের ৩৩ লক্ষ শিশু গুরুতর অপুষ্টিতে ভুগছে।

খাদ্য নিগমের ভাণ্ডারে চাল-গমের আকাল, এই যুক্তির সঙ্গে আদৌ কি বাস্তবের কোনও মিল আছে? সরকারের যুক্তি, চাল-গমের উৎপাদন কম। কেন্দ্রের কৃষি দপ্তর কী বলছে দেখা যাক। তাদের রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২১-২২-এ চাল উৎপাদন হয়েছে ১২৭.৯৩ মিলিয়ন টন, গত পাঁচ বছরের গড় উৎপাদনের থেকে ১১.৪৯ মিলিয়ন টন বেশি। গমের উৎপাদন গত পাঁচ বছরের গড় উৎপাদনের থেকে বেড়ে ২০২১-২২-এ হয়েছে ১১১.৩২ মিলিয়ন টন। ২০২২-২৩-এ চাল-গম উৎপাদন কমতে পারে এমন আশঙ্কার কথা বলে সরকার গম রপ্তানি বন্ধ করেছে গত চার মাস ধরে, চাল রপ্তানির উপরও নিয়ন্ত্রণ চলছে। বাস্তবে সত্যিই কি এই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমার আশঙ্কার কোনও সম্পর্ক আছে? যে ভাবে খাদ্যপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা এই নিয়ন্ত্রণের মুখ্য পরিচালক হয়ে উঠছেন, তাতে এই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যে দেশের সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার কোনও সম্পর্ক নেই, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া, ক'দিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকার যখন লক্ষ লক্ষ টন চাল মদ কোম্পানিগুলিকে ইথানল তৈরির জন্য দিচ্ছিল তখন যুক্তি তুলেছিল, এফসিআই গোডাউনে চাল উপচে পড়ছে, তাই জায়গার অভাবের জন্য তারা এ কাজ করছে। অর্থাৎ তাদের কথা অনুযায়ী, ভাণ্ডারে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত চাল-গম রয়েছে। তা সত্ত্বেও দেশের মানুষ যখন খাদ্য সঙ্কটে ডুবছে,তখন সরকারের এই অপরাধমূলক অবহেলা কেন? আর যদি সরকার এই সংকটকে মোকাবিলা করতে চায়, তাহলে উৎপাদিত চাল-গম সরাসরি চাষির থেকে কিনে সুলভে ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে না কেন? বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের হাতে খাদ্য পৌঁছে দিতে সরকারের হাতে রয়েছে বাফার স্টক। সেই স্টক প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন?

অন্যদিকে সরকার বাজারে চাল-গমের দামবৃদ্ধির কথা বলছে। দামবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করে সেই যুক্তি দেখিয়ে রেশন নিয়ন্ত্রণ করছে। এ অবস্থায় মানুষকে বাঁচাতে রেশনে সরকারি বরাদ্দ আরও বাড়ানো উচিত, যাতে তারা অন্তত রেশনের ভাত-রুটি খেয়ে দিন কাটাতে পারে। তা না করে রেশন ব্যবস্থায় বরাদ্দ কমানো সরকারের জনস্বার্থ রক্ষার নমুনা কি?

কেন্দ্র সরকার মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা দিতে যা যা করা দরকার তা না করে উল্টে গণবন্টন ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করছে। অথচ 'খাদ্যের অধিকার আইন', 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা'-র প্রচার করে ভোটের বাজার গরম করছে। আইন থেকে, প্রকল্প থেকে কী হবে, যদি খেয়ে বেঁচে থাকার অধিকারই মানুষের না থাকে?

বাস্তবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে জনস্বার্থের থেকে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাই প্রধান লক্ষ্য। পুঁজির সেবাদাস হিসাবেই তারা এই ভূমিকা পালন করছে। আর রাজ্যের শাসক দলগুলিও রেশনে বরাদ্দ বহাল রাখার দাবিতে কোনও রকম আন্দোলন না গড়ে তুলে শুকনো বিবৃতি দেওয়ার পথ নিয়েছে। এভাবে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। মানুষকে খাদ্য জোগানোর দায়িত্ব সরকার কোনওভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড গৌরপদ সাহা ২০ সেপ্টেম্বর দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

১৯৭৫ সালে ব্যবসার সূত্রে তিনি ডোমকলে আসেন। সেই সময় দলের কর্মী গজেন দাসের সূত্রে দলের সংস্পর্শে আসেন ও ডোমকলে কাজ শুরু করেন। ১৯৮০ সালে প্রাথমিক শিক্ষকতার চাকরি পান এবং নিজ গ্রাম জলঙ্গির বারোমাসিয়াতে ফিরে যান। সেখানে একনিষ্ঠভাবে দলের কাজ শুরু করেন। বারোমাসিয়া সহ আশপাশের গ্রামগুলিতে দলের প্রসার ঘটান। শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। এলাকাতে শুরু থেকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার কাজে যুক্ত ছিলেন। এ বছর অসুস্থতার মধ্যেও সেন্টার পরিচালনা করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর নার্ভের রোগে আক্রান্ত ছিলেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দলের কাজে ছিলেন একনিষ্ঠ। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় দলের সদস্য পদ পান। দীর্ঘদিন লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। মাঝে কিছুদিন লোকাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। অসুস্থতার কারণে এই দায়িত্ব বেশিদিন পালন করতে পারেননি।

অসুস্থতার মধ্যেও দলের মুখপত্র গণদাবী বিক্রি ও গ্রাহক করার কাজে ছিলেন নিয়মিত। তাঁর মরদেহ কলকাতা থেকে এলাকাতে এলে এলাকার জনগণ, কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। জলঙ্গি, ডোমকল ও ইসলামপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

২ অক্টোবর বারোমাসিয়া প্রাইমারি স্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় তাঁর জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী।

কমরেড গৌরপদ সাহা লাল সেলাম

হোসিয়ারি শ্রমিকদের জেলা সম্মেলন

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের দ্বাদশ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন ১৬ অক্টোবর কোলাঘাট ব্লকের উত্তর জিঞ্জাদা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক শ্রমিক অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বার্তা পাঠান। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য অনিন্দ্য রায়চৌধুরী। এছাড়াও ইউনিয়নের জেলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে রেটবৃদ্ধির দাবি সহ প্রভিডেন্ট ফান্ড-ইএসআই, সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মধুসূদন বেরাকে সভাপতি, নেপাল বাগ ও তপন কুমার আদককে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

টোটো চালকদের সভা মালদায়

মালদা জেলার কালিয়াচকে গোলাপগঞ্জ এলাকায় ১৭ অক্টোবর টোটো-চালকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রাম। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র মালদা জেলা সম্পাদক অংশুধর মণ্ডল। সম্মেলনে অংশুধর মণ্ডল, লালু ঘোষ ও বিদ্যুৎ গুহকে যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ২০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

১০ অক্টোবর এলাকার টোটো-চালকদের উপর ট্রেকার ইউনিয়নের দুষ্কৃতী-হামলার প্রতিবাদে প্রায় দুশো টোটো-চালক মিছিল করে হামলাকারীদের গ্রেফতারির দাবিতে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। ওসি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। এদিন নিজেদের দাবিতে ঐক্যবদ্ধআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের দাবিতে
বরোগুলিতে ডেপুটেশন

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে উৎসবের মরশুমের মধ্যেই কলকাতা তথা রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা

শহরে ঘরে ঘরে প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিপুল হারে পৌরকর নেওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থ প্রশাসনকে ধিক্কার জানিয়ে এবং রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে— এই দাবিতে ২২ অক্টোবর এসইউসিআই(সি)-র নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন বরোতে ডেপুটেশন, মিছিল, পথ অবরোধ, পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেহালা পূর্ব, পশ্চিম, সরশুনা ও ঠাকুরপুকুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে এলাকার মানুষ মিছিল করে (ছবি) পুরসভার ১৩ নং এবং ১৪ নং বরো প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। বেহালা ১৪ নং বাসস্ট্যান্ডের মোড় অবরোধ করা হয়। উত্তর কলকাতার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড় থেকে শুরু হয়ে একটি মিছিল কলেজ স্ট্রিট মোড়ে গিয়ে অবরোধ করে। ৫ নং বরোতে ডেপুটেশন দেয়। দক্ষিণ কলকাতার ৮ নং বরোতে মিছিল করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সর্বত্রই মিছিল থেকে দাবি ওঠে— ডেঙ্গু প্রতিরোধে পাড়ায় পাড়ায় মশা মারার স্প্রে ও ব্লিচিং দিতে হবে, জমে থাকা নোংরা আবর্জনা ও জমা জল নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে, পুরসভার ওয়ার্ড অফিসগুলিতে শুধু প্লেটলেট কাউন্ট নয়, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে পুরসভার ক্লিনিকগুলিতে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, ওষুধপত্র ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি পূরণ করতে সরকারকে তৎপর হতে হবে প্রভৃতি। পৌরপ্রশাসকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

দুর্নীতিমুক্ত ভাবে সমস্ত শূন্যপদে শিক্ষক
নিয়োগের দাবি বিপিটিএ-র

শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির পরিণামে চাকরিবঞ্চিত টেট-উত্তীর্ণদের আন্দোলন প্রসঙ্গে ১৯ অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির কাছে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে সমস্ত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের দাবি জানানো হয়।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, সরকারের নিয়োগের কোনও সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, মেধা তালিকা প্রকাশ না করে চাকরিপ্রার্থীদের কার্যত কোর্টে যেতে বাধ্য করা হয়, আবার কোর্টের অজুহাতে নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়। তাঁর অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রী গত বিধানসভা অধিবেশনে প্রাথমিকে ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও টেট-উত্তীর্ণদের সকলকে নিয়োগের জন্য শূন্যপদ প্রকাশ করা হয়নি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ২০১৪-তে যাঁদের চাকরি হয়নি, ২০১৭-তে যাঁরা পাশ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে ২০১২-র চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা যোগ করলে তা ২৫ হাজারের বেশি হবে না, যা শূন্যপদের সংখ্যার তুলনায় যৎসামান্য। তা হলে একসাথে নিয়োগ করা হবে না কেন?

তিনি অবিলম্বে ২০১৪ এবং ২০১৭ টেট উত্তীর্ণদের সকলকে একত্রে নিয়োগের জন্য পদসংখ্যা প্রকাশ করে মেধা-তালিকার ভিত্তিতে দুর্নীতিমুক্তভাবে নিয়োগের দাবি করেন। পাশাপাশি তিনি এই আন্দোলনের সমর্থনে সমিতির পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সভার কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন।

মধ্যপ্রদেশে কৃষক বিক্ষোভ

সরকারি অব্যবস্থার কারণে সার বিতরণের লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হয়েছে রাজ্যের এক কৃষকের। প্রতিবাদে প্রতিটি পঞ্চায়েতে সার বিতরণের দাবিতে ২২ অক্টোবর ধরনায় এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে চাষিদের বিক্ষোভ

টেট ঃ লড়াই ব্যর্থ হবে না

দুয়ের পাতার পর

প্রতিটিতে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। রেলের বর্তমান পরীক্ষার বেনিয়ম আমরা জানি। তিন বছর হয়ে গেল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল না। এ ছাড়া ইউজিসি, এনইউটি, ইউপিটিইটি, রাজস্থান এলিজিবিলিটি একজামিনেশন, কমন এন্ট্রান্স একজামিনেশন সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের ব্যাপম কেলেঙ্কারি নিয়োগের পরীক্ষার সমস্ত কেলেঙ্কারিকে ছাপিয়ে গেছে। এই দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে গিয়ে একজন তদন্তকারী অফিসার ও সাংবাদিক সহ ৫০ জনকে খুন করা হয়। অভিযোগের আঙুল উঠেছে ওই রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। এই সমস্ত দুর্নীতির কোনও সঠিক বিচার বা শাস্তি কিছুই হয়নি। সেই বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএম এখন তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। চাকরিপ্রার্থী আন্দোলনকারী এবং সাধারণ মানুষ জানে এই দলগুলোর আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভোট রাজনীতি, ক্ষমতা দখল।

রাজ্য জুড়ে বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ নষ্টের কার্নিভাল চলছে। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে নিয়োগ হচ্ছে না, ন্যায্য চাকরি অধরা থাকছে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির পারদ ক্রমাগত চড়ছে। আরও অনেক রাঘববোয়াল এর সাথে যুক্ত। অপরদিকে দুর্নীতির প্রতিবাদে মেধা তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবিতে হবু শিক্ষকেরা, যাদের শিক্ষাঙ্গনে থাকার কথা, তাঁরা ২০১৫ সাল থেকে রাস্তাতেই পড়ে রয়েছেন। দেশেও বেকারত্বের পারদ ক্রমাগত চড়ছে। চাকরির দাবিতে আন্দোলনও তীব্র হচ্ছে। প্রয়োজন এই লড়াইকে আরও সংগঠিত রূপ দেওয়া, সঠিক দিশা দেখানো। করুণাময়ীর আন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে থামিয়ে দিলেও এ লড়াই ব্যর্থ হবে না। একদিন তা ধারালো অস্ত্রে পরিণত হবে।

মহিলা সম্মেলন ময়নায়

১৫ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরে এআইএমএসএস-এর ময়না দক্ষিণ শাখার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে সম্মেলন থেকে বিলকিস বানুর ধর্ষণকারীদের কারামুক্তির বিরুদ্ধে, নারী-নিরাপত্তা, সমকাজে সমমজুরির দাবিতে, 'দুয়ারে মদ' প্রকল্প বাতিল সহ মদ ও মাদকদ্রব্য প্রসারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। সংগঠনের পক্ষে

উপস্থিত ছিলেন বেলা পাঁজা, শ্রাবণী পাহাড়ী প্রমুখ। সুচরিতা মাইতিকে সভানেত্রী, সুস্মিতা জানা ও মিঠু জানাকে যুগ্ম সম্পাদক, ছবি বাগকে কোষাধ্যক্ষ করে কুড়ি জনের কমিটি গঠিত হয়।

এআইডিওয়াইও-র বীরভূম জেলা সম্মেলন

অবিলম্বে এসএসসি, টেট-উত্তীর্ণ মেধা তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ, নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত নেতা-মন্ত্রীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সমস্ত সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ ও মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ২২ অক্টোবর মুরারইতে এআইডিওয়াইও-র চতুর্থ বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেড় শতাধিক যুবক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন।

শুরুতে বিভিন্ন দাবি সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন সহ একটি সুসজ্জিত মিছিল মুরারই শহর পরিক্রমা করে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র জেলা সম্পাদক মদন ঘটক, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জি এবং রাজ্য কমিটির সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল। আগামী দিনে শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হেমন্ত রবিদাসকে সভাপতি, সেমীম আক্তারকে সম্পাদক করে ৩৬ জনের শক্তিশালী জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com